ড. মৈত্রীশ ঘটক

অধ্যাপক
লন্ডন স্কুল অফ
ইকনমিক্স

ছেলেবেলা

ভাবতে শেখো

কী পড়বে? কী দেখবে? কীভাবে দেখবে?

আমরা ভাবি পড়াশুনো করা মানে অনেক কিছু জানা। অনেকসময়ই শুনতে পাবে "উনি অনেক জানেন" বা "উনি খুব পণ্ডিত" এই ধরনের কথা। কিন্তু ভেবে দেখো যে অভিধানে কত শব্দ আছে আর জ্ঞানকোষে (বা, ইন্টারনেটে) কত তথ্য আছে, কিন্তু এগুলো মুখস্থ করলেই কি জ্ঞানী হওয়া যায়? রান্নার রেসিপি বই মুখস্থ করলেই কি ভালো রান্না করা যায়? গাড়ির সমস্ত অংশ ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জানা থাকলেই কি গাড়ি চালানো যায়? চিকিৎসাবিদ্যার বই মুখস্থ করলেই কি চিকিৎসক হওয়া যায়?

আসলে তথ্য জানা থাকাটা কোনও কিছু শেখার একটা উপকরণ মাত্র। এর সঙ্গে কোনটা কীভাবে হয় সেটা বোঝা এবং নিজের চিন্তা ব্যবহার করে বাস্তবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সেই জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারাটাই হল কোনওকিছু সত্যিকারের জানা।

সুকুমার রায়ের 'জীবনের হিসাব' ছড়াটা পড়েছ?

বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই চড়ি সখের বোটে,
মাঝিরে কন, "বলতে পারিস সূর্যি কেন ওঠে?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে? জোয়ার কেন আসে?"
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যালফ্যালিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, "সারা জীবন মরলিরে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি।"

খানিক বাদে কহেন বাবু, "বলতো দেখি ভেবে
নদীর ধারা কেমনে আসে পাহাড় থেকে নেবে?
বলতো কেন লবণ পোরা সাগর ভরা পানি?"

মাঝি সে কয়, "আরে মশাই অত কি আর জানি?"
বাবু বলেন, "এই বয়সে জানিসনেও তা কি
জীবনটা তোর নেহাৎ খেলো, অষ্ট আনাই ফাঁকি!"

আবার ভেবে কহেন বাবু, "বলতো ওরে বুড়ো,
কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ঐ চুড়ো?
বলতো দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন?"
বৃদ্ধ বলে, "আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন?"
বাবু বলেন, "বলব কি আর বলব তোরে কি তা,-
দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা।"

খানিক বাদে ঝড় উঠেছে, ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন, নৌকাখানি ডুবলো বুঝি দুলে!
মাঝিরে কন, "একি আপদ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুবলো নাকি নৌকা এবার? মরব নাকি আজি?"
মাঝি শুধায়, "সাঁতার জানো?"- মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, "মশাই, এখন কেন কাবু?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে,
তোমার দেখি জীবন খানা ষোল আনাই মিছে!"

এখানে বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাইয়ের অনেক বইপড়া জ্ঞান আছে, কিন্তু সাঁতারের মতো বাস্তব জীবনে প্রাণ বাঁচাতে পারে এমন কিছু ব্যবহারিক শিক্ষা নেই। তার মানে কিন্তু উনি যেগুলো জানেন সেগুলো জানার কোনও মূল্য নেই তা নয়। সূর্যি কেন ওঠে না জানলে কলকাতায় যখন রাত তখন আমেরিকায় কেন সকাল বোঝা যাবে না আর তা না বুঝলে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন ব্যবস্থা পরিকল্পনা করা যাবে না। সেই রকম জোয়ার কখন আসে তা না জানলে নৌকো চালানো মুশকিল — হয় নৌকো ভাসবেই না, নয়তো ডুবে যেতে পারে। আর জোয়ার কেন আসে তা না বুঝলে ঠিক মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাঁধ তৈরি করা যাবে না। তাই এই ছড়াটি থেকে একরকমের জ্ঞান (সাঁতার জানা) অন্যরকমের জ্ঞানের থেকে (জোয়ার কেন আসে বা সূর্যি কেন ওঠে) বেশি দরকারি এই সিদ্ধান্তে আসা একেবারেই ঠিক হবে না। বরং এই ছড়াটির মূল কথা হল, সবরকমের জ্ঞানই পরিবেশ এবং অবস্থা অনুযায়ী কাজে লাগতে পারে, এমনকী প্রাণও বাঁচাতে পারে, আর তাই শুধু অনেক কিছু জানা আছে তাই নিয়ে বড়াই করার কোনও মানে হয় না।

এই যে বললাম, সবরকমের জ্ঞানই পরিবেশ এবং অবস্থা অনুযায়ী কাজে লাগতে পারে — তার জন্যে জানার সঙ্গে সঙ্গে বোঝাটা খুব দরকার। পরীক্ষার পড়ার জন্যে অনেক সময়ে আমরা মুখস্থ করে কাজ চালিয়ে দিই। এমনকি যাদের স্মৃতিশক্তি ভালো তারা পরীক্ষায় খুব ভালোও করতে পারে। কিন্তু এমন যদি প্রশ্ন আসে যার উত্তর সরাসরি পাঠ্যবইয়ে নেই, তখন তো মুখস্থবিদ্যা কাজে লাগবে না, তখন যুক্তি-বুদ্ধি খাটিয়ে উত্তর দিতে হবে। 'গোরুর রচনা' বলে একটা কথাই চালু আছে। একজন ছাত্র শুধু গোরুকে নিয়ে রচনা মুখস্থ করে গেছিল, কিন্তু পরীক্ষায় এল অন্য কিছু, যেমন ধরো 'বর্ষাকাল', আর সে শুরুতে এক লাইন দু-লাইন বর্ষা নিয়ে লিখে সোজা গোরু বিষয়ে চলে গেল আর বাকি রচনাটা তার মুখস্থ করা গোরুর রচনায় লিখে দিল। বলাই বাহুল্য সে ওই রচনায় পাশ নম্বর পায়নি। ধরো, তোমার নামতা মুখস্থ করা আছে ১ থেকে ২০ অবধি, কিন্তু প্রশ্ন এল আরও বড়ো কোনও সংখ্যা নিয়ে। মুখস্থ না থাকলেও, গুণ করা জানা থাকলে আমরা অঙ্ক কষে যে কোনও দুটো সংখ্যার গুণফল বার করতে পারি। তাই, যুক্তিটা একবার বুঝে ফেললে যান্ত্রিকভাবে মুখস্থ করার দরকার হয় না।

স্কুল-পরীক্ষা এসবের বাইরে যদি ভাবি, বাস্তব জীবনে কোনওকিছুই তো কোনও বাঁধা নিয়মে হয় না। ধরো তুমি বন্ধুর বাড়ি এমনিতে যে রাস্তা দিয়ে যাও সেই রাস্তা কোনও কারণে বন্ধ। তাই শুধু সেই রাস্তা দিয়ে যাবার পথ জানা থাকলে তুমি তো তার বাড়ি যেতে পারবে না। কিন্তু তার বাড়ি তোমার বাড়ির থেকে কত দূরে এবং কোন কোন রাস্তা দিয়ে গেলে পৌঁছোনো যায় পুরোটা বোঝা থাকলে, সেদিন মেন রোড বন্ধ থাক আর না থাক পৌঁছোতে কোনও অসুবিধে হবে না। যেমন খেলার মাঠে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম খাটে না — আগের দিন বৃষ্টি হয়েছে কী হয়নি, বিপক্ষের কোনও বিশেষ খেলোয়াড় খেলবে কী খেলবে না তার ওপর তোমার দলের কৌশল নির্ভর করবে। আসল কথা হল, জীবনে কোনও কিছুই বাঁধা গতে হবে এরকম আশা করা যায় না। তাই অনেক কিছু শুধু জানলে হবে না, কোনটা করলে কী হয় সেটা বোঝা খুব জরুরি আর তা বোঝা থাকলে যে কোনও রকম পরিস্থিতিরই মুখোমুখি হওয়া যায়।

'কী' ভাববের থেকে বেশি জরুরি 'কীভাবে' ভাববে এবং ভাবনা নিয়ে তিনটে সরল সূত্র

একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করি। ধরো, সকালে উঠে দেখলে তোমাদের বাড়ির বারান্দায় অনেকটা জল পড়ে আছে। তুমি কী ভাববে? কতগুলো সম্ভাবনা হল, বৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে, তোমাদের বা পাশের বাড়ির পাইপ ফেটে লিক হয়ে থাকতে পারে, বা বাড়ির কেউ বারান্দা পরিষ্কার করতে গিয়ে অনেক জল ঢেলে থাকতে পারে। কী করে ঠিক করবে কী হয়েছে? এবার তোমার কাজ কী হবে? বোঝার চেষ্টা করা কোনটা হয়েছে—বৃষ্টি হলে রাস্তাঘাট ভেজা থাকবে তাই সেটা দেখতে হবে। পাইপ ফেটে থাকলে বিশেষ কিছু জায়গায় জল হবে, সব জায়গায় নয়। আর এ দুটোর কোনওটাই না হলে, বাড়ির লোককে জিজ্ঞেস করতে হবে বারান্দায় এত জল পড়ল কী করে, কেউ বারান্দা ধুয়েছে কিনা। ধরো, বোঝা গেল বৃষ্টিই পড়েছে এবং আকাশ মেঘলা, মানে আবার বৃষ্টি পড়তে পারে, তাহলে তুমি কী করবে? যদি বেরোনোর থাকে ছাতা বা রেনকোট বার করে রাখবে।

ভেবে দেখো, ব্যাপারটা নেহাতই সামান্য হলেও তুমি যা করছ সেটা কোনও গোয়েন্দা কোনও অপরাধের তদন্ত করতে গিয়ে ঠিক তাই-ই করে থাকেন। অর্থাৎ, প্রথমে কী হয়েছে সেটা দেখা। তারপর

কোন কোন কারণে হয়ে থাকতে পারে সেগুলো ভাবা। তারপর কোন কারণে হয়ে থাকলে তার কী প্রমাণ খুঁজে বার করতে হবে সেটা ভেবে বার করা এবং সেই অনুযায়ী তথ্য জোগাড় করা। এবং রহস্যের সমাধান হলে, কী করণীয় সেটা ঠিক করা। আবার সম্পূর্ণ অন্য পরিস্থিতি এবং পেশার একটা উদাহরণ দিই — চিকিৎসা। যদি কোনও ডাক্তারের কথা ভাবো, তিনি আগে দেখেন রুগির কী হয়েছে (অর্থাৎ, উপসর্গগুলো কী), তারপর বার করার চেষ্টা করেন কেন হয়েছে (তার জন্যে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়), এবং তারপর কী করতে হবে (অর্থাৎ, চিকিৎসা) সেটা নিয়ে তাঁর মতামত দেন।

যে কোনও জিনিস নিয়ে কীভাবে ভাববে এর উত্তরও কিন্তু এর মধ্যে আছে। কোনও কিছু নিয়ে ভাবতে গেলে প্রশ্নের আকারে এই তিনটে সরল সূত্র মনে রাখতে পারো—কী হয়েছে, কেন হয়েছে এবং তাহলে কী করা উচিত?

আরেকটা কথা খেয়াল রাখা উচিত, আমাদের নিজেদের কী মনে হচ্ছে আর বাস্তব পরিস্থিতি কী তা সবসময়ে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, অর্থাৎ, নিজে দেখে বা শুনে, আমরা যা শিখি আর বই পড়ে যা শিখি তাদের আপেক্ষিক ভালো-মন্দ এবং কখন কোনটার ওপর বেশি জোর দেব খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তো সব কিছু জানা সম্ভব নয়। এই বিপুল পৃথিবীতে এত কিছু আছে এবং প্রতিনিয়ত হয়ে চলেছে, যে আমাদের অন্যদের বর্ণনা থেকে শিখতেই হবে। আর যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে শেখা সম্ভব, তখনও খেয়াল রাখতে হবে যে বাইরের জগতকে আমাদের নিজেদের দেখা-শোনা-ছোঁয়ার মাধ্যমে যেটুকু বোঝা সম্ভব তার ওপরে সবসময় ভরসা করা যায় না। যেমন, শুধু চোখে দেখে কোনও কিছু কত লম্বা মাপতে গেলে ভুল হতে পারে (আমাদের নিজেদের দৈর্ঘ্য, কোথা থেকে দেখছি এসবের ওপর নির্ভর করে), তাই মাপার জন্যে ফিতে লাগে। তোমার খুব গরম বা ঠান্ডা লাগছে মানেই সেদিন খুব গরম বা ঠান্ডা না-ই হতে পারে, হয়তো তোমার শরীর ভালো নেই, তাই এরকম মনে হচ্ছে। এখানে তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র থাকলে সবাই একমত হতে পারে, সেদিন বেশি গরম না বেশি ঠান্ডা। সেরকমই বাস্তব জগতে যে কোনও কিছু নিয়েই কী হচ্ছে সেটা বোঝার জন্যে এমন কিছু মাপকাঠি দরকার, যা, কে দেখছে তার ওপর নির্ভর করে না, আর তাই তার সত্যতা নিয়ে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি।

পাঠ্য বই না গল্পের বই

আমাদের বাইরে যে জগৎ, সেটা এত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে সব বিষয়ে সব রকম জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয় - আমাদের হাতে সময় এবং মাথায় জায়গা তো আর অনন্ত নয়। তাই স্কুলের বাধ্যতামূলক পড়াশুনো বাদ দিলে যা ভালো লাগে তাই পড়বে। কিন্তু কী খেতে ভালো লাগে, অনেক রকম খাবার চেখে না দেখলে যেমন বোঝা যায় না, সেরকম কী পড়তে ভালো লাগে তা অনেক বই না ঘাঁটলে বা পরখ করে না দেখলে বুঝতে পারবে না। তাই খানিকটা নিজের ভালো লাগা আর খানিকটা ইচ্ছে করে যে বই বা পত্রিকা হাতে আসে বা চোখে পড়ে সেগুলো উলটে পালটে দেখা এবং গোগ্রাসে পড়া দরকার। আমার ছোটোবেলায় আমার বাড়ির সবাই আমাকে অনেক বই উপহার দিতেন, তার মধ্যে রহস্য-রোমাঞ্চ থেকে কমিক বই থেকে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বই সবই ছিল। তা ছাড়া পাড়ার ম্যাগাজিনের দোকানে গিয়ে নানা পত্রিকা ঘাঁটার অনুমতি ছিল, কারণ সেই দোকানের মালিককে ছোটোবেলা থেকে আমার দাদু এবং মা চিনতেন। তা ছাড়া ছিল পাড়ার লাইব্রেরি। এখন বিদেশে বহু বছর আছি, কিন্তু

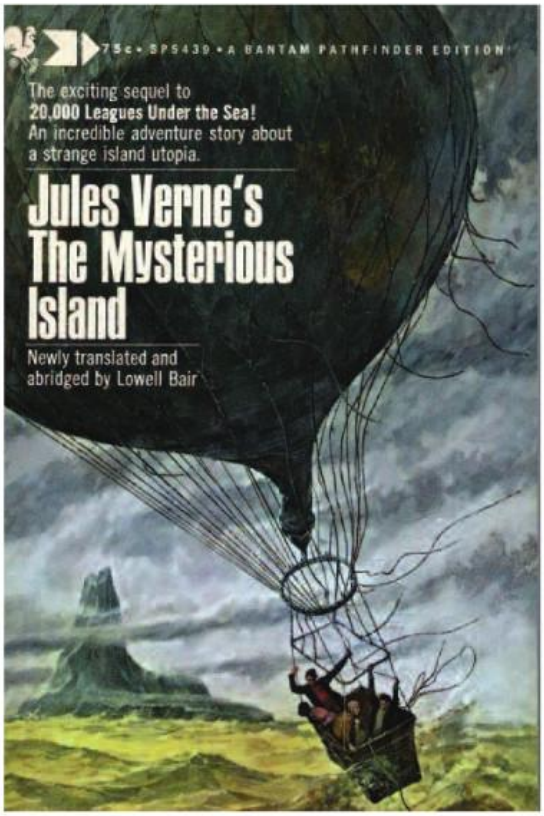

ছোটোবেলার প্রিয় বইগুলো সব হাতের কাছেই বইয়ের তাকে আছে, যখন ইচ্ছে খুলে পড়তে শুরু করি এবং আবার ছোটোবেলায় ফিরে যেতে পারি।

আসলে সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়োতে গেলে কখন কী পাব তার যেমন ঠিক নেই, সেইরকম বইয়ের ক্ষেত্রেও যা হাতে পাবে তাই পড়া উচিত। এখানে ভালো লাগার একটা বড়ো ভূমিকা আছে। কোনও বই একটু পড়ে ভালো না লাগলে, সেটা ছেড়ে আরেকটা বই পড়তে পারো, কোনও অসুবিধে নেই। যতই হোক, পাঠ্যবই তো নয় যে পরীক্ষার ভয়ে পড়তেই হবে ! তবে মা বাবা বা যিনি অভিভাবক তাঁর কথা শুনে চলা ভালো, না হলে এত রকম পড়ার জিনিস আছে, সব সমান ভালো না লাগতে পারে, এবং সব বয়েসের উপযুক্ত না হতে পারে।

পড়া বা জানার মূল উদ্দেশ্য তোমার কী ভালো লাগে এবং তুমি কীসে ভালো এই দুটো ব্যাপার চিহ্নিত করা। এটা একদিনে হয় না, বড়ো হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার এটা একটা অঙ্গ এবং তুমি সচেতনভাবে না ভাবলেও, তলায় তলায় তোমার মন এই কাজটা করে যায়।

এখন কী ভালো লাগে আর তুমি কীসে ভালো — এই দুটো যদি মিলে যায় তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু সবসময়ে এ দুটো নাও মিলতে পারে। তোমার হয়তো গল্পের বই পড়তে ভালো লাগে, কিন্তু অঙ্কে ভালো হলেও তোমার অঙ্ক করতে ভালো লাগে না। এবং অবশ্যই কিছু বিষয় আছে যা তোমার ভালো লাগে না এবং তুমি তাতে ভালো নও। যতদূর অবধি না পড়ে উপায় নেই, ততদূর অবধি সামলে নিয়ে ভবিষ্যতে এমন বিষয় এড়িয়ে চলাই ভালো।

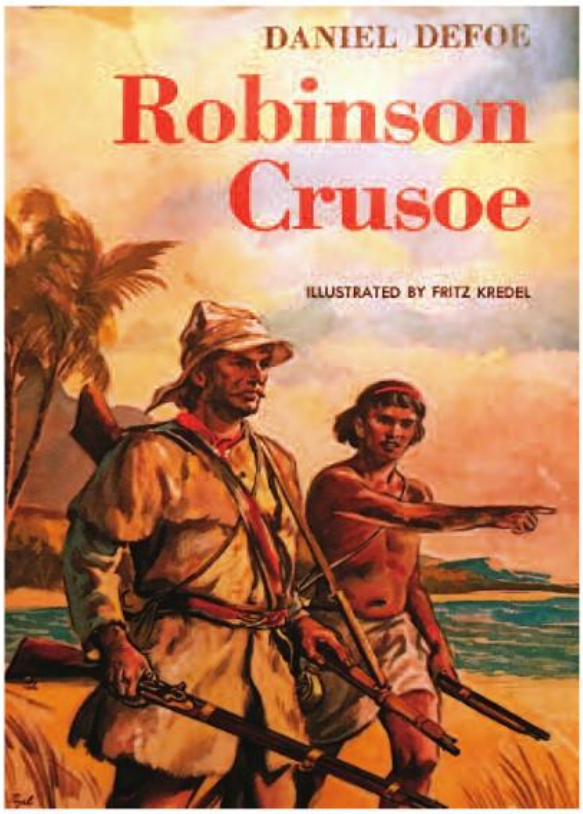

কিন্তু, অনেক সময় কোনও বিষয় ভালো লাগা বা না লাগা শিক্ষকের ওপর নির্ভর করে। আমি ছোটোবেলায় অঙ্ক পারতাম কিন্তু খুব একটা ভালো লাগত না। আমার অঙ্কের এক মাস্টারমশাই একবার একটা মজার গল্প বলেন, সেই থেকে আমার মনে হতে শুরু করে যে অঙ্ক ব্যাপারটা যতটা রসকষহীন মনে হয়, ততটা তো নয়। ধরা যাক, এমন একটা হোটেল আছে যেখানে ঘরের সংখ্যা অগণিত। হোটেলের নামটাও সেরকমই - অনন্ত হোটেল ! অনন্ত মানে হল, যার অন্ত বা শেষ নেই। কিন্তু মুশকিল হল, একজন নতুন অতিথি এসেছেন আর হোটেলের ম্যানেজার তাঁকে বললেন আমাদের সব ঘরেই লোক আছে, তাই জায়গা নেই। তখন অতিথি, যিনি অঙ্কের মাস্টারমশাই, বললেন আপনি ১ নম্বর ঘরের অতিথিকে ২ নম্বর ঘরে সরিয়ে দিন, ২ নম্বর ঘরের অতিথিকে ৩ নম্বর ঘরে, ৩ নম্বর ঘরের অতিথিকে ৪ নম্বর ঘরে এবং এরকম করতে থাকলে, সব পুরোনো অতিথিই নতুন ঘর পেয়ে যাবেন (এবং সেটা তাঁদের আগের ঘরের পাশেই হবে) আর ১ নম্বর ঘরটা নতুন অতিথিকে দিয়ে দেওয়া যাবে। গল্পটার মজাই হল যে এমন তো করা যায় না কারণ ঘরের সংখ্যা অনন্ত বাস্তব জীবনে কী করে হবে? হোটেলে ঘর তো আর মহাকাশের তারার মতো নয়। কিন্তু 'অনন্ত' ব্যাপারটা যে রহস্যময় অথচ অঙ্কে সেটাকে সুন্দর করে ধরা যায় সেটা এর থেকে বোঝা যায়। এরকম গল্প আরও আছে। যেমন, ধরো পাড়ার কোনও কিপটে লোকের কাছে কোনও ত্রাণ বা সেবামূলক কাজের জন্যে তুমি চাঁদা চাইতে গেলে এবং ৫০০ টাকা চাইলে, আর উনি শুনেই না বলে দিলেন। কিন্তু তুমি যদি বল, একদিনে দিতে হবে না,

স্কুলের বাধ্যতামূলক পড়াশুনো বাদ দিলে যা ভালো লাগে তাই পড়বে। কিন্তু কী খেতে ভালো লাগে অনেকরকম খাবার চেখে না দেখলে যেমন বোঝা যায়না, সেরকম কী পড়তে ভালো লাগে তা অনেক বই না ঘাঁটলে বা পরখ করে না দেখলে বুঝতে পারবে না। তাই খানিকটা নিজের ভালো লাগা আর খানিকটা ইচ্ছে করে যে বই বা পত্রিকা হাতে আসে বা চোখে পড়ে সেগুলো উলটে পালটে দেখা এবং গোগ্রাসে পড়া দরকার।

আপনি আজ আমায় মাত্র এক টাকা দিন, কালকে ২ টাকা, পরশু ৪ টাকা, এমনি করে মাত্র দশদিন ধরে যদি দেন। উনি যদি সুকুমার রায়ের 'দানের হিসাব' গল্পটি না পড়ে থাকেন বা অঙ্কে কাঁচা হন এবং তোমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান, দশদিনের মাথায় উনি দেখবেন ওঁর সব মিলিয়ে একহাজার টাকার ওপর বেরিয়ে গেছে।

আমার ছোটোবেলায় পড়া অনেক গল্পের বইয়ের মধ্যে কতগুলো বই আমার ভাবনাচিন্তার ওপর বড়ো ছাপ ফেলেছিল। এরই মধ্যে আছে কিছু অ্যাডভেঞ্চারের গল্প যেখানে মানুষ সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতিতে তাদের বই থেকে পাওয়া জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে ফল পাচ্ছে। তার একটা উদাহরণ হল, জুল ভার্নের 'আশ্চর্য দ্বীপ'। প্রশান্ত মহাসাগরের এক বিজন দ্বীপে ছয়জন অভিযাত্রী এক বেলুন যানের দুর্ঘটনার ফলে আটকে পড়েন এবং চার বছর সেই দ্বীপে তাঁদের থাকতে হয়। সেখানে আগুন জ্বালাবার এক চমৎকার উপায় পড়ে খুব ভালো লেগেছিল—দু'জন তাঁদের হাতঘড়ির কাঁচ খুলে একসঙ্গে এমনভাবে রোদের তলায় ধরেন যে তা আতস কাঁচের (magnifying lens) মতো কাজ করে এবং শুকনো পাতায় সেই আলোটা ফেললে তাতে আগুন ধরানো যায়। এরকম উদাহরণ এই বইয়ে আরও অনেক আছে, যেমন আছে ড্যানিয়েল ডিফো-র 'রবিনসন ক্রুসো' বইয়ে। আসলে প্রয়োগের মধ্যেই জ্ঞানের সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা, এই উদাহরণগুলো সেটাই প্রমাণ করে।

আরও একটা কথা। জানার জন্যে বই পড়া দরকার কিন্তু শুধু বই পড়লেই জানা হয় না। একটু আগেই বলেছি বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাইয়ের কথা। আসলে আমাদের চারপাশে যে পৃথিবী, মানুষ, ঘটনা — এই সব কিছু থেকেই আমরা শিখি। শিখি প্রত্যক্ষ ভাবে, যেমন, গরম জিনিসে হাত দিলে ছ্যাঁকা লাগে। আবার পরোক্ষভাবেও শিখি। বাইরের জগৎ থেকে এমন সব প্রশ্ন বা চিন্তা মাথায় আসে যা থেকে আমাদের মনে হয়, এটা তো জানি না, কাকে জিজ্ঞেস করি বা কোন বই (বা কোন ওয়েবসাইটে) এর উত্তর পাব? তাই সারাক্ষণ বই বা মোবাইল ফোনের দিকে না তাকিয়ে আমাদের বাইরের পৃথিবীটা ভালো করে দেখা উচিত, স্কুল বা টুইশনের বাইরে খেলা, হাতের কাজ, লোকের সঙ্গে মেলামেশা, বেড়ানো—এসবের মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়ানো উচিত।

সুকুমার রায়ের কবিতার বানান অপরিবর্তিত রাখা হল।

অলংকরণ শান্তনু দে